অমুসলিম নাগরিক
ও
জামায়াতে ইসলামী

অধ্যাপক গোলাম আযম

অমুসলিম নাগরিক
ও
জামায়াতে ইসলামী

হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও উপজাতীয় বাংলাদেশী
নাগরিকদের প্রতি আকুল আবেদন

অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশক
অধ্যাপক মোঃ তাসনীম আলম
চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৫০৪ এলিফ্যান্ট রোড,
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩১২৩৯, ৯৩৩১৫৮১, ৮৩৫৮৯৮৭

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
মে - ১৯৮৪

৭ম প্রকাশ
মার্চ - ২০০৫
চৈত্র - ১৪১১
সফর - ১৪২৬

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

মূল্য ঃ নির্ধারিত নয় টাকা মাত্র

O MUSLIM NAGORIK O JAMAAT-E-ISLAMI (Non-Muslims and Jamaat-E-Islami) by Prof. Ghulam Azam, Published by Publication Department, Jamaat-E-Islami Bangladesh, Seventh edition, March 2005.

প্রাথমিক কথা

এ দেশে জামায়াতে ইসলামী যে ধরনের সমাজ ব্যবস্থা চালু করতে চায় এবং যে রাজনৈতিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক বিধান কায়েম করতে চায়, তা জনগণের জন্য যতই কল্যাণকর হোক, জনগণের সমর্থন ছাড়া তা বাস্তবায়িত হতে পারে না। জামায়াতে ইসলামী এতদিন পর্যন্ত শিক্ষিত মুসলিম সমাজের কাছে এর আদর্শ ও উদ্দেশ্য পেশ করে একটা মজবুত সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তুলেছে। এখন ব্যাপক আকারে দেশের জনগণের ময়দানে আন্দোলনকে সম্প্রসারিত করার সময় এসেছে। তাই দেশের অমুসলিম ভাই-বোনদের কাছে জামায়াতের বক্তব্য তুলে ধরা অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

জামায়াতে ইসলামী এ কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে, কোন মতবাদ বা আদর্শ জনগণের উপর জোর করে চাপিয়ে দিলে তা একদিকে যেমন কল্যাণকর হয় না, অপরদিকে তা স্থায়ীও হয় না। তাই এ দেশের সকল নাগরিকের সমর্থন ছাড়া জামায়াতের মহান উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। এ কারণেই দেশের অমুসলিম নাগরিকদের সমর্থনও সমভাবে জরুরী। সুতরাং জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে অমুসলিমগণও যাতে সঠিক ধারণা পেতে পারেন, সে উদ্দেশ্যেই এ পুস্তিকাটি রচিত।

অমুসলিম পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ যে, বইটির আবেদনকে আরও উন্নত করার উদ্দেশ্যে আমাকে পরামর্শ দেবেন।

গোলাম আযম

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কে

এ বইটি প্রকাশিত হবার পর চার মাসের মধ্যেই সমুদয় কপি বিক্রয় হয়ে যাওয়ায় আমি অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করছি। অমুসলিম ভাই-বোনদের কাছে বইটি সমাদৃত হচ্ছে জেনে আমি মহান আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞ।

আমার জন্মভূমির যে সব নাগরিক আমার মাতৃভাষায়ই কথা বলেন, তাদের কাছে জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য এত দেরীতে পরিবেশন করেছি বলে আমি নিজকে অপরাধী বিবেচনা করছি।

অমুসলিম পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে এ বইটির প্রতি যেরূপ আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তাতে আমি এ আশা পোষণ করছি যে, তারা জামায়াতে ইসলামীকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানার জন্য এ পুস্তিকার ৩২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বই ক'টি মনোযোগ দিয়ে পড়বেন।

অমুসলিমগণ নিজ নিজ ধর্মে থেকেও সুবিচারমূলক কল্যাণরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তুলবার মহান ব্রত নিয়ে জামায়াতে ইসলামীর সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাদেরকে সংগঠনভুক্ত করার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, তা এ পুস্তিকার শেষাংশে উল্লেখ করা হয়েছে। —লেখক

বিষয়সূচি

১.	হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ও আমার অভিজ্ঞতা	৫
২.	অমুসলিমদের প্রতি আকুল আবেদন	৬
৩.	কুরআনের বিধানকে জানুন	৭
৪.	এক হিন্দু মনীষীর অনুবাদ	৭
৫.	জামায়াতের দৃষ্টিতে অমুসলিম	৮
৬.	হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের উত্থান-পতন	৯
৭.	সংখ্যালঘু সমস্যা	১০
৮.	হিন্দুদের বর্তমান রাজনৈতিক মর্যাদা	১১
৯.	জামায়াতে ইসলামী ও সংখ্যালঘু সমস্যা	১২
১০.	রাজনৈতিক অঙ্গনে জামায়াতের সাথে সংখ্যালঘুদের সম্পর্ক	১২
১১.	ধর্ম-নিরপেক্ষবাদ ও জামায়াতে ইসলামী	১৪
১২.	ধার্মিকতা, ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা	১৫
১৩.	ইসলামের মূল বক্তব্য	১৭
১৪.	জামায়াতে ইসলামীর মৌলিক ২ দফা	২২
১৫.	ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য	২৩
১৬.	গভীরভাবে বিবেচনা করুন	২৪
১৭.	অমুসলিমদের সম্পর্কে দরদপূর্ণ ভাবনা	২৫
১৮.	ধার্মিকতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব	২৭
১৯.	জামায়াতে ইসলামীকে জানতে হলে	২৯

হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ও আমার অভিজ্ঞতা

আমি ১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। ইংরেজী, বাংলা ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপকগণের মধ্যে সামান্য কয়েকজন ছাড়া সবাই হিন্দু ছিলেন। বিভাগীয় প্রধান তো সবাই ছিলেন হিন্দু। তাঁদের মধ্যে অনেকেই যেমন আমার অতি শ্রদ্ধেয় ছিলেন, তেমনি আমি কয়েকজনের খুবই প্রিয় ছাত্র ছিলাম।

১৯৪৬ সালে অবিভক্ত ভারতে যে নির্বাচন হয়, তা পৃথক নির্বাচন পদ্ধতিতে হওয়ায় নির্বাচনী ময়দানে জনগণের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম বিরোধেরও কোন কারণ ঘটেনি। মুসলিমদের ভোটে মুসলিম প্রতিনিধি এবং হিন্দুদের ভোটে হিন্দু প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার যে পদ্ধতি তখন চালু ছিল, তার কারণে রাজনৈতিক অংগনে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষের সুযোগ ছিল না।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর আমার ঐ সব শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ ক্রমে ক্রমে এ দেশ থেকে যখন চলে যেতে লাগলেন, তখন তাঁদেরকে সশ্রদ্ধ বিদায় সম্বর্ধনা দিতেও আমরা ত্রুটি করিনি। পাকিস্তান আন্দোলনে আমি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও কোন সময় আমার মনে হিন্দু-বিদ্বেষ অনুভব করিনি। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো মিলে একটি রাষ্ট্র এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো নিয়ে আর একটি পৃথক রাষ্ট্র কায়েম করার ব্যাপারে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যে সমঝোতা হয়ে যাবার পর সাম্প্রদায়িক তিক্ততা খতম হবারই কথা ছিল, কিন্তু কী কী কারণে তা হয়নি সে কথা এখানে আলোচ্য বিষয় নয়।

১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে আমরা হিন্দু-মুসলিম মিলিত প্যানেল নিয়েই নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। ঢাকা হলের প্রতিনিধি বাবু অরবিন্দ বোস ডাকসুর ভি,পি, হলেন এবং আমি ফজলুল হক মুসলিম হলের প্রতিনিধি হিসেবে ডাকসুর জি,এস, হলাম। আমরা দু'জনই হিন্দু হল ও মুসলিম হলসমূহ থেকে প্রচুর ভোট পেয়েছিলাম। সেখানে হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষের কোন লক্ষণই ছিল না।

১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত আমি রংপুর কারমাইকেল কলেজে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক থাকাকালে হিন্দু সহকর্মীদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমার ছাত্র জীবনের হিন্দু বন্ধুদের কেউ আর এদেশে নেই। আর ঐ অধ্যাপকগণও অবসরপ্রাপ্ত হয়ে বিদেশে চলে গেছেন।

অমুসলিমদের প্রতি আকুল আবেদন

আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, এদেশের অমুসলিম নাগরিকগণ স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের কল্যাণ কামনার সাথে সাথে দেশেরও কল্যাণ চান। কারণ দেশে অশান্তি বিরাজ করলে তারা কোথায় শান্তি পাবেন? দেশের মংগল-অমংগলের সাথে সকল নাগরিকের ভাগ্যই সমভাবে জড়িত। এদেশে এখনও কোন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো স্থিতিশীল হয়নি। বিভিন্ন দল ও আন্দোলন দেশটাকে তাদের নিজস্ব মতবাদ ও আদর্শে গড়ে তুলবার চেষ্টা করছে।

জামায়াতে ইসলামী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদের (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) অনুকরণে কুরআনের বিধানকে এদেশে চালু করতে চায়। তাই যারা অন্য আদর্শের অনুসারী, তারা জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে জঘন্য অপপ্রচারে লিপ্ত। এ সব বিরোধীদের প্রচারণায় পক্ষপাতমূলক ধারণা নিয়ে জামায়াত সম্পর্কে কোন মতামত স্থির করা একেবারেই অযৌক্তিক। সুতরাং অমুসলিম নাগরিকদের কাছে আমার আকুল আবেদন যে, আপনারা সরাসরি জামায়াতের সাহিত্য, জামায়াতের সংগঠন, এর কার্যাবলী ও সদস্যদের নিকট থেকে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে মতামত স্থির করুন। আশা করি এটা একটা জাতীয় দায়িত্ব মনে করেই আপনারা জামায়াতকে জানার চেষ্টা করবেন।

রাজনৈতিক ময়দানে নাকি এখন দলের সংখ্যা শ' খানিক। বিভিন্ন দল দেশকে বিভিন্নভাবে গড়তে চাচ্ছে। একটা নতুন দেশ হিসেবে এখন এ দেশটি আদর্শিক দিক দিয়ে নোঙ্গরহীন অবস্থায়ই আছে। এ দিক দিয়ে দেশের ভবিষ্যত এখন একেবারেই অনিশ্চিত।

জনগণের সমস্যার সমাধান দিতে হলে কোন আদর্শকে ভিত্তি করেই তা সম্ভব। আদর্শহীন লোক শাসনের নামে শোষণই করে থাকে। আর আদর্শের ময়দানে ইসলাম ছাড়া আর কিছু যে নেই, সে কথা প্রত্যেক সচেতন নাগরিকই দেখতে পাচ্ছেন।

আমি এদেশের অমুসলিম নাগরিকদেরকে এ কথা গভীরভাবে বিবেচনা করার জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি। যা দেশের জন্য কল্যাণকর, তা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবারই জন্য মঙ্গলকর।

জামায়াতে ইসলামী কুরআনের বিধান অনুযায়ী এদেশের সব সমস্যার সমাধান করতে চায়, যেমন ১৪শ' বছর আগে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আরব দেশে করেছিলেন। এদেশে যখন এ আন্দোলন দানা বেঁধেছে, তখন এ সম্বন্ধে ভালভাবে জানবার চেষ্ট করা দেশের সব নাগরিকেরই কর্তব্য। অমুসলিম নাগরিকগণও আশা করি জানার দায়িত্ব বোধ করবেন।

ইসলামের নাম শুনেই জামায়াতে ইসলামীকে সাম্প্রদায়িক কোন দল মনে করলে মারাত্মক ভুল হবে। ইসলামী শাসন মানে মুসলিম নামধারী ইসলাম বিরোধী চরিত্রের লোকদের শাসন নয়। কুরআনে যে বিধান রয়েছে, তা বাস্তবে কায়েম করলেই ইসলামী শাসন হবে। ইসলাম ও মুসলিম এক কথা নয়। জামায়াতে ইসলামী মুসলিম শাসন চায় না, ইসলামী শাসন চায়।

তাই যে কোন মুসলিমকে জামায়াতে ইসলামী এর সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে না। চিন্তা, কথা, কর্ম ও চরিত্রে ইসলামের সত্যিকার অনুসারী না হলে জামায়াতে ইসলামী কাউকে সদস্য করে না। তাই জামায়াতে ইসলামী একটি আদর্শিক দল। কোন সম্প্রদায় বিশেষের লোক হলেই এর সদস্য হওয়া যায় না।

কুরআনের বিধানকে জানুন

আপনি হিন্দু, খ্রিস্টান বা উপজাতি যা-ই হোন, এদেশের নাগরিক হিসেবে আপনার ও আমার ভাগ্য একই সূত্রে গাঁথা। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা থাকলে আমরা সবাই এর সুফল ভোগ করতে পারব। আর এর বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হলে দুর্ভোগের ভাগও আমরা সমানই পাব।

আমাদের সবাইকে একই স্রষ্টা পয়দা করেছেন। তিনি একই সূর্য থেকে আমাদের সবাইকে সমভাবে আলো দিচ্ছেন। তিনি হিন্দুর জন্য পৃথক 'জল' আর মুসলমানদের জন্য আলাদা 'পানি' তৈরি করেননি। এদেশের আকাশ বাতাস আমাদের সবার জন্যই সমান।

তেমনিভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং দেশ শাসনের বেলায় আমাদের সবার স্রষ্টা যদি কোন বিধান দিয়ে থাকেন, তাহলে চন্দ্র, সূর্যের মতো তা সবারই জন্য উপকারী হবে। কুরআন মুসলমানদের সম্পত্তি নয়। কুরআন ঐ মহান স্রষ্টারই রচিত বিধান, যিনি গোটা বিশ্ব স্রষ্টা।

এক হিন্দু মনীষীর অনুবাদ

১৯ শতকের শেষ দিকে ঢাকারই এক হিন্দু মনীষী সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করেন। তাঁর নাম গিরীশ চন্দ্র সেন। তিনি শুধু অনুবাদই করেননি। তাঁর লিখিত কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পড়ে আমি বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছি। ৪২ বছর বয়সে তিনি আরবি ভাষা শেখা শুরু করেন। উর্দূ ও ফারসী ভাষা আগেই শিখেছিলেন। টীকা সম্বলিত তাঁর অনুদিত কুরআনের সর্বশেষ সংস্করণ ১৯৭৯ সালে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯১০ সালে তিনি ঢাকায় পরলোক গমন করেন।

তাঁর লিখিত গ্রন্থের শুরুতে 'আল-কুরআনের আহ্বান' শিরোনামে কুরআনের বাণীসমূহকে বিষয় ভিত্তিতে তিনি যে নিপুণতার সাথে সাজিয়েছেন, তাতে কুরআনের

শিক্ষাকে তিনি যে কতটা আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা অনুমান করা যায়। এ পরিচ্ছেদের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'কুরআন শরীফ আল্লাহর বাণী। মানুষের জীবনকে সুন্দর, পবিত্র ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করার জন্য এ মহাগ্রন্থে আল্লাহ নানান বিধি-নিষেধের উল্লেখ করেছেন, সহজতম উপদেশ দান করেছেন। মানুষের জীবনকে শান্তিময় করার জন্যই আল কুরআনের অবতারণা। সুতরাং কুরআন শরীফ হলো বিশ্বমানুষের জন্য ঐশ্বরিক সংবিধান। এ মহাগ্রন্থে পাওয়া যাবে ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনে সঠিক চলার অভ্রান্ত পথ-নির্দেশ।' *এ ভূমিকার পর তিনি বিষয়সূচি অনুযায়ী প্রতি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বাণীসমূহ কুরআনের বিভিন্ন স্থান থেকে চয়ন করেছেন।*

এ কুরআন তাদেরই জন্য পথ-নির্দেশক, যারা পথ তালাশ করে। মুসলমান শিক্ষিত লোকদের ক'জন কুরআন বুঝার জন্য এ রকম কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করেন? সুতরাং মুসলমান নামধারী হলেই কুরআনের সাধক হয় না। গিরীশ চন্দ্র সেন মহাশয় মুসলমান না হয়েও কুরআনের শিক্ষাকে জানার ও মানার চেষ্টা করে সবার জন্য উদাহরণ স্থাপন করে গেছেন।

জামায়াতের দৃষ্টিতে অমুসলিম

আমার দেশের হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলিম নাগরিকদের সাথে আমার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন অভিন্ন হওয়ার ফলে এদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করতে গেলে অমুসলিম ভাই-বোনদের কথা বাদ দেবার কোন উপায় নেই। তাই জামায়াতে ইসলামী তাদেরকে কী দৃষ্টিতে দেখে, সে কথা পয়লাই বলা দরকার।

জামায়াতে ইসলামী এদেশের অমুসলিম নাগরিকদেরকে এদেশের সন্তান হিসেবে দেশের মুসলিম নাগরিকদের সমমর্যাদার নাগরিক মনে করে। জামায়াতে ইসলামী এ দেশে কুরআনের শাসন চায়। মানবিক অধিকারের ব্যাপারে কুরআন মুসলিম ও অমুসলিম কোন পার্থক্য করে না। কুরআনে স্রষ্টা স্বয়ং অমুসলিম নাগরিকদেরকে যে মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে, তা পরিবর্তন করে কেউ তাদের অধিকার খর্ব করতে চাইলে জামায়াতে ইসলামী কুরআনের মর্যাদার স্বার্থেই এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে। ধর্ম একেবারেই বিশ্বাস ও মনের ব্যাপার। মনের উপর যেহেতু শক্তি প্রয়োগ করা যায় না, সেহেতু জোর করে মুসলমান বানাবার বিরুদ্ধে কুরআন অত্যন্ত সোচ্চার। জামায়াত মনে করে যে- হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মের নাগরিকগণ নিজ নিজ ধর্ম পালন করেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে কুরআনের বিধানকে সমর্থন করতে পারেন। যদি অন্যান্য মতবাদের সাথে তুলনা করে কুরআনের বিধানকে তারা অধিকতর কল্যাণকর মনে করেন, তাহলে নিজ নিজ ধর্মে থেকেও তারা জামায়াতে ইসলামীর সাথে সহযোগিতা করতে পারেন। কেউ যদি হিন্দু থেকেই সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করতে পারেন, তাহলে যুক্তির বিচারে কুরআনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধানকে

অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করলে হিন্দু হিসেবেও তা সমর্থন করতে পারেন। তাই জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক দর্শন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো সমর্থন করতে হলে ধর্মীয় দিক দিয়েও মুসলিম হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। নিজ ধর্ম ত্যাগ করে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও কুরআনকে নেমে চলার জন্য প্রস্তুত হওয়া ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ব্যাপার। কিন্তু ধর্মান্তরিত না হয়েও কুরআনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধানকে মেনে নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমগণ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করেছেন বলে ইতিহাসে উজ্জ্বল প্রমাণ রয়েছে।

হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের উত্থান-পতন

বাংলাদেশের বর্তমান (২০০১) জনসংখ্যা প্রায় তের কোটি। এর মধ্যে এক কোটিরও বেশি অমুসলিম। অমুসলিমদের মধ্যে চার ভাগের তিন ভাগই হিন্দু ধর্মাবলম্বী বাকী এক-চতুর্থাংশ বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য উপজাতি।

এ হিসেব অনুযায়ী কমপক্ষে ৭০-৭৫ লাখ হিন্দু এদেশে বাস করছেন। শহরে ও গ্রামে মুসলমানদের পাশাপাশি শত শত বছর থেকে একই দেশে বাস করার ফলে হিন্দু-মুসলিম পারস্পরিক পরিচয় এককালে আরো ঘনিষ্ঠ ছিলো। বর্তমানেও এ সম্পর্ক গ্রামাঞ্চলে প্রায় আগের মতোই দেখা যায়।

পাকিস্তান আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে মুসলিম জাতীয়তাবাদের দাবীর ফলে এবং দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হবার কারণে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই তিক্ত হয়।

কিন্তু পাকিস্তান কায়েম হবার পর এ তিক্ততা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ক্রমেই কমতে থাকে। এমনকি ভারতে মুসলিম হত্যা চলতে থাকলেও এদেশের মুসলমানরা এর কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। ফলে হিন্দু-মুসলিম সুসম্পর্ক এদেশে ক্রমেই পূর্বের অবস্থায় উন্নীত হয়ে গিয়েছিল।

১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সম্পর্ক বিনষ্ট হবার কোন কারণই ঘটেনি। "পৃথক নির্বাচন" পদ্ধতির মাধ্যমে ঐ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় মুসলিম ভোটারদের ভোটে মুসলিম প্রার্থী এবং হিন্দু ভোটারদের ভোটে হিন্দু নির্বাচিত হয়েছিলেন। ফলে রাজনৈতিক ময়দানে হিন্দু ও মুসলিমদের কোন বিরোধ বা সমস্যাই সৃষ্টি হয়নি।

ঐ নির্বাচনে শেরে বাংলা ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী সাহেবদের নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট বিপুলভাবে জয়লাভ করলেও কিছুদিন পরেই শেরে বাংলা ও আওয়ামী মুসলিম লীগের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়। ফলে যুক্তফ্রন্ট দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং আইন পরিষদের হিন্দু সদস্যদের হাতে ক্ষমতার ভারসাম্য চলে যায়। প্রথমে হিন্দু সদস্যগণ শেরে বাংলার সাথেই ছিলেন। ১৯৫৪ সালের শেষভাগে

* হরফ প্রকাশনী এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলকাতা-৭ থেকে এ গ্রনন্থখানি "কুরআন শরীফ" নামে প্রকাশিত।

আওয়ামী মুসলিম লীগের জয়পুরহাট সম্মেলনে'দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দ তুলে দিয়ে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে দলীয় আদর্শ ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ আইন পরিষদে হিন্দু সদস্যদের সমর্থন লাভের ব্যবস্থা করে। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ দুটো ব্যবস্থার পর আওয়ামী লীগ আইন সভায় হিন্দু-সদস্যদের সমর্থনে মন্ত্রিসভা গঠনে সক্ষম হয়।

সে সময়কার হিন্দু নেতৃবৃন্দ যুক্ত-নির্বাচনের সমর্থন কেন করেছিলেন তা তারাই ভাল জানেন। যুক্ত-নির্বাচন দ্বারা হিন্দুদের সত্যি কোন উপকার হয়েছে কিনা তাও তারাই বলতে পারেন। কিন্তু জনগণের ময়দানে ভোটের ব্যাপারে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কটা আবার কিছু তিক্ত হয়ে গেলো। পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় আইন সভার ভিতরে মুসলিম সদস্যদের দ্বিধা-বিভক্তির ফলে হিন্দু সদস্যদের যে রাজনৈতিক সুবিধা ছিল তাতে জনগণের ময়দানে কোন রকম তিক্ততার কারণ ঘটেনি। কিন্তু যুক্ত-নির্বাচনে ভোটের ময়দানে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় পরিস্থিতি ভিন্ন রকম হয়ে পড়লো।

এখন অবস্থা এই দাঁড়াল যে, হিন্দু ভোটারদের চেয়ে মুসলিম ভোটদাতার সংখ্যা বেশী হওয়ায় শুধু হিন্দু ভোটে কোন প্রার্থীর বিজয়ের কোন সম্ভাবনা রইল না। এর ফলে হিন্দু ভোটারদের নিয়ে মুসলিম দল ও প্রার্থীরা টানাটানি করার সুযোগ পেলো। এ পরিস্থিতিটা হিন্দুদের জন্য কোন দিক দিয়েই লাভজনক প্রমাণিত হয়নি। একদিকে হিন্দু জনসংখ্যার ভিত্তিতে তারা পার্লামেন্টে কোন প্রতিনিধিত্ব পেলেন না। অপরদিকে রাজনৈতিক ময়দানে মুসলিম ভোটারদের কাছে তারা কোন সম্মানজনক পজিশনও পাননি। পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল।

সংখ্যালঘু সমস্যা

দুনিয়ার প্রায় দেশেই কোন না কোন আকারে স্থায়ী সংখ্যালঘু সমস্যা বিরাজ করে। গণতন্ত্রের যত দোহাই-ই দেয়া হোক, স্থায়ী সংখ্যালঘু সমস্যা শাসনতন্ত্রে যতভাবেই দূর করার ব্যবস্থা থাকুক, বাস্তবে তা থেকেই যায়। এদেশের দীর্ঘ হাজার বছরের ইতিহাসকে মুছে ফেলে রাজনৈতিক ময়দানে হিন্দু ও মুসলিমকে একক সত্তা বানাবার কোন উপায় নেই। হিন্দুগণ এদেশে ধর্মীয় দিক দিয়ে যেমন সংখ্যালঘু, তেমনি রাজনৈতিক ময়দানেও সংখ্যালঘু। কোন রকমেই এ অবস্থার অবসান সম্ভব নয়।

সুতরাং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু হিসেবে ধরে নিয়েই রাজনৈতিক সমাধান দিতে হবে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও উপজাতিসমূহকে তাদের নিজস্ব সত্তা হিসেবেই গণ্য করতে হবে এবং তাদেরকে এ দেশের নাগরিক হিসেবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য যাবতীয় অধিকার দিতে হবে। তাদের জোর করে রাজনৈতিক ময়দানে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সাথে এক সত্তায় পরিণত করলে কি ফল দাঁড়ায় তা সবাই দেখতেই পাচ্ছেন। এটা একেবারেই অবাস্তব চিন্তা।

হিন্দুদের বর্তমান রাজনৈতিক মর্যাদা

এ কথা কারো অজানা নয় যে, রাজনৈতিক দিক দিয়ে হিন্দুদেরকে এদেশের মুসলিম জনগণ একটি পৃথক সত্তা মনে করে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর থেকে যে সব হিন্দু এদেশ ছেড়ে চলে যাননি, তাদেরকে পৃথক সত্তা মনে করলেও তারা যে এ দেশেরই স্থায়ী নাগরিক সে কথাও অস্বীকার করা চলে না। এদেশের ভাল-মন্দের সাথেই তাদের ভাগ্য জড়িত। তবুও দেখা যায় যে, সাধারণতঃ মুসলমানরা আজও তাদেরকে ভারত ঘেঁষা বলে মনে করে। অথচ পাকিস্তান হবার মাত্র দু'বছর পর ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের সময়ও হিন্দুদের সম্পর্কে জনগণের মধ্যে এ ধারণা ছিল না। কারণ পৃথক নির্বাচনের কারণে রাজনৈতিক ময়দানে হিন্দুদের সাথে জনগণের কোন সংঘর্ষ বা মতবিরোধ ছিল না। কিন্তু যুক্ত-নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচনের বেলায় মুসলমানদের সাথে তাদের বিরোধ সৃষ্টি হয়। মুসলমানরা লক্ষ্য করে যে, হিন্দু ভোটারদের জোরে মুসলিম নামধারী এমন প্রার্থী বিজয়ী হয়ে যায়, যে চিন্তা ও চরিত্রে মুসলিম বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এর ফলে মুসলিম চেতনাসম্পন্ন সবাই হিন্দু ভোটারদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিরোধী বলে মনে করতে বাধ্য হয়।

১৯৭৭ সাল থেকে ৯৬ সাল পর্যন্ত যে ক'টা নির্বাচন হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, এ দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটাররা আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেনি। যে কারণেই হোক বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠী ভারতকে এদেশের নিঃস্বার্থ বন্ধু মনে করে না। তারা আওয়ামী লীগকে ভারতের বন্ধু মনে করে এবং হিন্দুদেরকে আওয়ামী লীগের সমর্থক বলে ধারণা করে। পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা থাকলে এ জাতীয় ধারণা সৃষ্টির কোন পরিবেশই থাকতো না। তাই হিন্দু ভোটে হিন্দু প্রতিনিধি এবং মুসলিম ভোটে মুসলিম প্রতিনিধি নির্বাচনের বিধান ছাড়া হিন্দুদের রাজনৈতিক মর্যাদা বহাল করার কোন উপায়ই দেখা যাচ্ছে না।

এ কথা হয়তো অনেকেরই জানা নেই যে, পাকিস্তান আন্দোলনেরও বহু বছর আগে থেকেই পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু ছিল। বৃটিশ ভারতে তফসিলী হিন্দু, মুসলমান, শিখ ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমেই সংখ্যানুপাতিক হারে আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলো। আজও এদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও উপজাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমেই জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব পেতে পারেন। এ পথেই সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান সহজ ও সম্ভব।

কিন্তু এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত অমুসলিম নাগরিকদের স্বাধীন ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। সংখ্যাগরিষ্ঠদের পক্ষ থেকে সংখ্যালঘুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের উপর পৃথক নির্বাচন চাপিয়ে দেয়ার প্রস্তাব আসা স্বাভাবিক নয়। সংখ্যালঘুদের পক্ষ থেকে এ জাতীয় প্রস্তাব পেশ করা হলে জাতীয় সংসদ তা বিবেচনা করতে পারে।

জামায়াতে ইসলামী ও সংখ্যালঘু সমস্যা

জামায়াতে ইসলামী এ কথা বিশ্বাস করে যে, একমাত্র পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমেই রাজনৈতিক ময়দানে হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করা সম্ভব। এ ব্যবস্থায় হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুগণ তাদের জনসংখ্যার ভিত্তিতে জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব পাবেন এবং জনগণের ময়দানে মুসলমানদের সাথে বিরোধ সৃষ্টিরও কোন কারণ ঘটবে না। তাদেরকে ভারতপন্থী বলে সন্দেহ করারও কোন সুযোগ থাকবে না। আইন সভায় তাদের ভূমিকা প্রকাশ্যভাবেই সবাই দেখতে পাবে। গোপন তৎপরতার কোন অজুহাত তুলে কেউ তাদের বিরুদ্ধে দুর্নাম রটাবারও সুযোগ পাবে না।

এ কথা নিশ্চয়ই তারা বুঝেন যে, কোন কালেই তারা সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত হবেন না। তাদেরকে সংখ্যালঘুই থাকতে হবে। জামায়াতে ইসলামী মনে করে যে, তারা পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমেই সঠিক মর্যাদা ফিরে পাবেন। তাদের অধিকার পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করার উপায়ও এটাই। সংখ্যালঘু সমস্যার সঠিক সমাধানও তাই। কারণ হিন্দু ও মুসলিমের পার্থক্য রাজনৈতিক ব্যাপার নয়। তাই রাজনৈতিক দিক দিয়ে এ পার্থক্য দূর করা যাবে না। হিন্দু হিসেবেই তাদের পৃথক সত্তার স্বীকৃতি দিতে হবে। এ ছাড়া এর অন্য সমাধান নেই।

রাজনৈতিক অঙ্গনে জামায়াতের সাথে সংখ্যালঘুদের সম্পর্ক

জামায়াতে ইসলামী এ দেশের অমুসলিম নাগরিকদের কাছে সঠিকভাবে নিজের পরিচয় তুলে ধরার সুযোগ পায়নি। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় থেকে এক শ্রেণীর মুসলিম নেতৃবৃন্দ যেভাবে ইসলামের নামকে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে এসেছে, তাতে অমুসলিমগণ জামায়াতে ইসলামীকে একটি সাম্প্রদায়িক দল বলে সন্দেহ করলে তাদেরকে দোষ দেয়া যায় না। পাকিস্তান আমলে ২৫ বছরের শাসনকালে ক্ষমতাসীনগণ মুখে ইসলামের নাম নিয়েছেন, আর বাস্তবে ইসলাম বিরোধী সব কিছুই করেছেন। মুসলিমদের সমর্থন আদায় করার স্বার্থে তারা ইসলামের নাম ব্যবহার করেছেন, কিন্তু ইসলামের মহান আদর্শের পক্ষে কোন একটি কাজও করেননি।

ইসলামের শ্লোগানদাতা তথাকথিত মুসলিম নেতা ও দল থেকে জামায়াতে ইসলামীর পরিচয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। জামায়াতে ইসলামী মুসলিম নামধারী লোকদের সংগঠন নয়। জামায়াত তাদেরকেই সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে, যারা চিন্তা ও মনোভাব এবং কথায় ও কাজে নিষ্ঠার সাথে ইসলামী জীবন-বিধান অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করে। অর্থাৎ জামায়াতে ইসলামী মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি দল নয়। ইসলামী আদর্শ, নীতি ও পদ্ধতিতে মানব সমাজকে গড়ে তোলার আন্দোলনের নামই জামায়াতে ইসলামী।

সুতরাং জামায়াত কোন সাম্প্রদায়িক দল নয়। কারণ ইসলাম কোন সাম্প্রদায়িক মতবাদ নয়। এ দেশে অগণিত রাজনৈতিক দল আছে এবং নেতাদের মধ্যে অনেকেই মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তারা ইসলামী আদর্শ ও জীবন-বিধানের সমর্থক নন। বরং বহু দল ও মুসলিম নেতা ইসলাম বিরোধী বলে পরিচিত। ইসলাম যদি সাম্প্রদায়িক ব্যাপার হতো, তাহলে মুসলিম নামের সবাই ইসলামের সমর্থক হতো।

পাকিস্তান আন্দোলন ও ইসলামী আন্দোলনের পার্থক্য বুঝলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ইসলামের নাম ব্যবহার করলেও ইসলামী আদর্শ কায়েমের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করেনি। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় মুসলিমদের আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই তাদের আসল লক্ষ্য ছিল। অখণ্ড ভারতে একটি রাষ্ট্রের অধীনে থাকলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাও অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে থাকতে বাধ্য হতো। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়াই ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের নেতাদের মূল উদ্দেশ্য।

তাই ইসলামের নামে পাকিস্তান আন্দোলন করা হলেও সে আন্দোলন ইসলামী আন্দোলনে উন্নীত হতে পারেনি। ইসলামী জীবন-বিধান কায়েম করা যদি আন্দোলনের উদ্দেশ্য হতো, তাহলে মুসলিম লীগ শাসনের বিরুদ্ধে জামায়াতে ইসলামীকে ইসলামী শাসনতন্ত্রের আন্দোলন করতে হতো না। মুসলিম লীগের গোটা শাসনকালে সরকারের সাথে জামায়াতে ইসলামীর সংঘর্ষ লেগেই ছিল। আইয়ুব খাঁর ১০ বছরের শাসনামলে একমাত্র জামায়াতে ইসলামীকেই পৃথকভাবে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছিল। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, জামায়াতে ইসলামী কোন সাম্প্রদায়িক দল নয়।

যারা এদেশের অমুসলিম নাগরিক, তারা হিন্দু মতবাদ বা খ্রিষ্টান মতবাদ বা বৌদ্ধ মতবাদ রাজনৈতিক ময়দানে চালু করার দাবী করেন না। কিন্তু এ দেশের নাগরিক হিসেবে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চয়ই তারা চান। কারণ এ ছাড়া কোন নাগরিকই নিরাপত্তা বোধ করতে পারেন না এবং শান্তিতে বসবাস করা সম্ভব মনে করেন না।

এ অবস্থায় তারা কোন পথকে এদেশের ও নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে করেন? কেউ মনে করেন যে, সমাজতন্ত্র ভাল। আবার অন্য কেউ নিশ্চয়ই অনুভব করেন যে, সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা নেই বলে তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আবার কেউ নির্ভেজাল গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হতে পারেন।

জ্ঞানী লোকেরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র এক সাথে চলতে পারে না। সমাজতন্ত্র শুধু রাজনৈতিক মতবাদ নয়- এটা একটা পৃথক সমাজ-দর্শন। আর গণতন্ত্র শুধু সরকার গঠনের একটি পদ্ধতি মাত্র। আদর্শ ও মতবাদ হিসেবে সমাজতন্ত্র অত্যন্ত ব্যাপক। তাই গণতন্ত্রের সাথে এর রাজনৈতিক পদ্ধতিতে পার্থক্য থাকলেও সমাজতন্ত্রের বিকল্প মতবাদ হিসেবে গণতন্ত্র যথেষ্ট নয়। প্রশ্ন জাগে যে, যারা সংগত

কারণেই সমাজতন্ত্র পছন্দ করেন না, তাদের কাছে বিকল্প মতাদর্শ আর কি আছে? এখানেই ইসলামের আবির্ভাব। সমাজতন্ত্র থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে শুধু গণতান্ত্রিক অস্ত্রই যথেষ্ট নয়। একমাত্র ইসলামের মত পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান ও সমাজ-দর্শনই বিকল্প মতাদর্শ হিসেবে সমাজতন্ত্রকে উৎখাত করতে সক্ষম।

এ দেশের হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ভাইদের কাছে জামায়াতে ইসলামী এ কথাটা গভীরভাবে চিন্তা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে যে, তারা ইসলামের চেয়ে সমাজতন্ত্রকে কেন বেশি পছন্দ করবেন? গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন ও সরকার গঠনের বেলায় তাদের সাথে জামায়াতের কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। তাহলে সমাজতন্ত্রের জায়গায় ইসলামকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গ্রহণ করতে আপত্তি হবার কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

ধর্মীয় ব্যাপারে হিন্দু থেকেও রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ হিসেবে ইসলামকে স্বীকার করতে কোন বাধা নেই। এ দেশের শতকরা ৮৫ জন মুসলিম হওয়ার কারণে ইসলামী আদর্শকে এখানে চালু করতে চেষ্টা করলে সাফল্যের আশা সবচেয়ে বেশী এবং এর ফলে কোন বিদেশী শক্তির আধিপত্য কায়েম হওয়ার কোন আশঙ্কাও নেই।

এদেশের অমুসলিম নাগরিকদের নিকট জামায়াতের আবেদন নিম্নরূপঃ

এদেশে যখন ইসলামী আদর্শ কায়েমের আন্দোলন চলছে, তখন আপনাদের পক্ষে এ বিষয়ে চোখ বন্ধ করে থাকা মোটেই উচিত নয়। এ আন্দোলনকে সঠিকভাবে জানা ও বুঝা আপনাদের এক বিরাট দায়িত্ব। যদি এ আন্দোলন দেশের জন্য ক্ষতিকর বিবেচিত হয়, তাহলে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান উচিত। কিন্তু যদি এটা কল্যাণকর মনে হয়, তাহলে এর সাথে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করা কর্তব্য। সুতরাং এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছার জন্য এ আন্দোলনকে ভালভাবে জানতে হবে। সরাসরি জ্ঞান লাভ করা ছাড়া সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব নয়। আশা করি আপনারা এ বিষয়টাকে ধীরভাবে বিবেচনা করবেন।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও জামায়াতে ইসলামী

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সংজ্ঞা সবাই এক রকম দেয় না। এর অর্থ যদি এটা হয় যে, ধর্মের ব্যাপারে কোন পক্ষপাতিত্ব করা চলবে না এবং সব ধর্মকে স্বাধীনভাবে পালন করার সমান সুযোগ দিতে হবে, তাহলে জামায়াতে ইসলামী এ কথা সমর্থন করে। কিন্তু কেউ যদি ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে বলেন যে, "ধর্ম শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকবে, সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্কই থাকবে না," তাহলে এটা অবাস্তব কথা। যে ব্যক্তি সত্যিকার ধার্মিক, তাকে শুধু ব্যক্তি জীবনেই নয়, জীবনের সব ক্ষেত্রেই ধার্মিক হতে হবে। বিশেষ করে ইসলাম মানুষের বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ধর্ম নয়।

প্রকৃত কথা এই যে, ইসলাম শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রের পথ দেখায় না, ইসলাম মানব জীবনের সব ময়দানেই বিধান দিয়েছে। কেউ কেউ শুধু ইসলামের ধর্মীয় দিকটুকু পালন করাই যথেষ্ট মনে করে। তারা এর সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক বিধানকে পালন করা প্রয়োজন মনে করে না। জামায়াতে ইসলামী ইসলামের সবটুকুকেই মানব জাতির জন্য শ্রেষ্ঠ বিধান বিবেচনা করে। কোন অমুসলিম যদি নিজ ধর্ম পালন করেও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ইসলামী বিধানকে অন্য বিধান থেকে উন্নত মনে করে পালন করতে চান, তাহলে তা-ও তিনি করতে পারেন।

যারা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের দোহাই দিয়ে রাজনৈতিক ময়দানে হিন্দু ও মুসলিমকে এক সত্তায় পরিণত করা সম্ভব বলে ধারণা করেন, তাদের এ ভ্রান্ত মত ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান সমর্থন করেনি। ভারতে হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়কেও অভিন্ন রাজনৈতিক সত্তায় পরিণত করা সম্ভব হয়নি। আয়ারল্যান্ড একই খ্রিস্ট ধর্মের দুটো শাখা প্রটেস্টান্ট ও ক্যাথলিককে রাজনৈতিক ময়দানে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি। সুতরাং এ দেশে এ ব্যর্থ চেষ্টা দ্বারা হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক আরও তিক্ত হওয়া ছাড়া কোন লাভ হবে না।

ভারতে ধর্মনিরপেক্ষবাদের যে কঠিন মূল্য মুসলিম নাগরিকদেরকে দিতে হচ্ছে, তা বিশ্বে ভারতের মর্যাদা ক্ষুণ্নই করেছে। আসামে মুসলিম সংখ্যালঘু ভোটাররা (১৯৮৩ সালের) নির্বাচনে অহমিয়দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় ইন্দিরা সরকারের জোর করে চাপিয়ে দেয়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার যে মর্মান্তিক পরিণতি ভোগ করেছে, তা ঐ ধর্মনিরপেক্ষবাদেরই চরম ব্যর্থতার জ্বলন্ত সাক্ষী।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুর সম্পর্ক মধুর রাখার প্রয়োজনেই ধর্মনিরপেক্ষবাদ বর্জন করতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের রাজনৈতিক দলাদলিতে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদেরকে নিয়ে টানাটানি করার সুযোগ থাকাটা সাম্প্রদায়িক সুন্দর পরিবেশের জন্য মোটেই উপযোগী নয়।

ধার্মিকতা, ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা

যারা বিবেকের দাবীতে, মনের তাকিদে ও যুক্তির ভিত্তিতে কোন ধর্ম পালন করে, তারাই ধার্মিক। এ জাতীয় মানুষের মন স্বাভাবিক কারণেই উদার হয়ে থাকে। তারা আন্তরিকতার সাথে নিজ ধর্ম পালন করে। তাই অন্য ধর্মের নিষ্ঠাবান অনুসারীদের সম্পর্কেও তারা ভাল ধারণা পোষণ করে।

যে মুসলিম তার ধর্মের বিধান মেনে চলে, সে যখন অন্য কোন মুসলিম নামধারী ব্যক্তিকে ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করতে বা ইসলামের নৈতিক বিধানকে অমান্য করতে দেখে, তখন সে কিছুতেই তার সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করতে পারে না। কিন্তু সে যখন অন্য ধর্মের কোন লোককে তার নিজ ধর্ম পালনে নিষ্ঠাবান দেখতে পায়, তখন ভিন্ন ধর্মের ঐ মানুষটিকে সে ভালবাসতে বাধ্য হয়। ভিন্ন ধর্মের লোক হওয়ার দরুন তার প্রতি বিরূপ মনোভাব সে পোষণ করে না।

অপরপক্ষে যে নিজের ধর্মকেই মেনে চলে না, সে অন্য ধর্মের অনুসারী মানুষকে কী করে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে? প্রকৃতপক্ষে ধর্মই মানুষের মন থেকে সংকীর্ণতা দূর করে। সত্যিকার ধার্মিক লোকই সব মানুষকে স্রষ্টার সেরা সৃষ্টি হিসেবে সম্মানের যোগ্য বলে মনে করে।

ধার্মিকতা ও ধর্মান্ধতা কখনও এক হতে পারে না। যারা কোন বিশেষ এক ধর্মের কতক অনুষ্ঠান গতানুগতিকভাবে পালন করে এবং অন্ধভাবে ধর্মের খোলসটুকু নিয়েই চলে, কিন্তু ধর্মের মূল উদ্দেশ্য বুঝে না, তারা সহজেই ধর্মান্ধতার রোগে আক্রান্ত হয়। তারা নিজ ধর্মকে এতটা অন্ধভাবে মেনে চলে যে, তারা অন্য ধর্মের লোকদেরকে ধর্মহীন মনে করে ঘৃণা করে বসে।

সত্যিকার ধার্মিক কখনো ধর্মান্ধ হতে পারে না। যারা ধর্মকে পার্থিব স্বার্থে ব্যবহার করে, তারাই ধর্মান্ধ হয়। যারা নৈতিক উন্নয়নের জন্য ধর্ম পালন করে এবং পরকালীন মুক্তিই যাদের ধর্মীয় জীবনের লক্ষ্য, তাদেরকে ধর্মান্ধতা কখনো স্পর্শ করতে পারে না। সত্যিকার ধার্মিকতা মানুষকে উদার বানায় এবং অন্য সব মানুষকে ভালবাসতে শেখায়।

সাম্প্রদায়িকতার সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। কোন একটি মানবগোষ্ঠী যখন কোন একটি বিশেষ ভাষা, বর্ণ, পেশা ইত্যাদির ভিত্তিতে শ্রেণী-চেতনা বোধ করে, তখনই তারা একটি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। তখন তারা নিজেদের সম্প্রদায়গত স্বার্থে ভিন্ন ভাষা, বর্ণ, বা পেশার লোকদের বিরুদ্ধে মারমুখো হয়ে পড়ে। আদর্শহীন ও নীতিহীন লোকেরা নিজেদের নেতৃত্বের স্বার্থেই তাদের সম্প্রদায়কে ভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে।

আসামে বাংলাভাষীদের বিরুদ্ধে অহমীয় ভাষীদের বিদ্বেষ সাম্প্রদায়িকতারই একটি রূপ। ধর্মের খোলস পরেও সাম্প্রদায়িকতা আত্মপ্রকাশ করে থাকে। ভারতে যে সব মুসলিম গণহত্যা হচ্ছে, তা সত্যিকার ধার্মিকদের কাজ নয়। ধর্মের দোহাই দিয়ে অধার্মিক ও ধর্মান্ধরাই এ জাতীয় সাম্প্রদায়িক কুকাণ্ড করে থাকে। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের আগে ও পরে যে সব হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়েছে, তা ধার্মিক লোকেরা করেনি। আমার ছাত্র জীবনেও ঢাকায় হিন্দু-মুসলিম দাংগা স্বচক্ষে দেখেছি। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিই এ সব দাঙ্গার উৎস। উভয় দিকের গুণ্ডা প্রকৃতির লোকেরা অপর সম্প্রদায়ের যে কোন ভাল মানুষকে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি।

১৯৪৪ সালের কথা। পত্রিকায় পড়েছিলাম যে, বোম্বের হিন্দু ও মুসলিম গুণ্ডারা পৃথক পৃথক সমাবেশে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে যে, তারা নিজ সম্প্রদায়ের বেশ্যাদের স্বার্থে অপর সম্প্রদায়ের বেশ্যাদের কাছে যাবে না। এরা আসলেই গুণ্ডা ও চরিত্রহীন। ধর্মের সাথে তাদের এ সিদ্ধান্তের কী সম্পর্ক? অথচ তারা হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় হিসেবেই চিন্তা করেছে।

ইসলামী আদর্শ এ জাতীয় ধার্মিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার বহু উর্ধ্বে। মানুষের মংগলের জন্যই ইসলাম এসেছে। ইসলামের দোহাই দিয়ে মন্দ লোকেরা ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা রোগে আক্রান্ত হতে পারে। কিন্তু এমনটা হওয়া সত্যিকার ধার্মিকদের পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। জামায়াতে ইসলামীকে যারা সাম্প্রদায়িক বলে গালি দেয়, তারা রাজনৈতিক হীন স্বার্থেই তা করে থাকে। কারণ, আদর্শের দিক দিয়ে তারা জামায়াতের বিরোধিতা করতে অক্ষম হয়ে শেষ পর্যন্ত গালির পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে।

ইসলামের মূল বক্তব্য

জামায়াতে ইসলামীর জীবন-দর্শনের নাম ইসলাম। এ নাম কুরআনেই দেয়া হয়েছে। স্রষ্টা কুরআনে তাঁর নিজের নাম দিয়েছেন আল্লাহ এবং মানব জাতির জন্য তিনি যে জীবন-বিধান কুরআনে দিয়েছেন, তার নাম রেখেছেন ইসলাম। তিনি কুরআনে গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করে অতি দরদের ভাষায় কথা বলেছেন। তাঁর ঐ বক্তব্যের সার সংক্ষেপ এখানে পেশ করছি, যাতে পাঠক-পাঠিকাগণ মোটামুটি ধারণা করতে পারেন। যারা বিশ্বপতির বক্তব্যের সারকথা জানার পর মূল বক্তব্য জানতে চান, তারা "তরজমায়ে কুরআন মজীদ" নামে কুরআনের সংক্ষিপ্ত টীকাযুক্ত বাংলা অনুবাদ পাঠ করলে আরও স্পষ্ট ধারণা পাবেন। আর যদি বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাঠ করে তৃপ্তি পেতে চান, তাহলে "তাফহীমুল কুরআন" নামক ব্যাখ্যা অধ্যয়ন করতে পারেন।

আল্লাহ তাঁর কুরআনে মানুষকে সম্বোধন করে যে বিস্তারিত কথা বলেছেন, তার সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

১। হে মানুষ! তোমাদেরকে আমিই সৃষ্টি করেছি এবং সৃষ্টি জগতে তোমরা শ্রেষ্ঠ।

২। হে মানুষ! তোমাদের সেবার জন্যই মহাবিশ্বের সব কিছু আমি তৈরি করেছি। আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি তোমাদেরই সেবায় নিযুক্ত। এরা কেউ তোমাদের পূজা-উপাসনা পাওয়ার যোগ্য নয়। আমি ছাড়া তোমাদের চেয়ে বড় কেউ নেই। তাই তোমরা সবাই শুধু আমার হুকুম মতো চলো তাহলে শান্তি পাবে।

৩। অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে সূর্যের মতো মহাসৃষ্টি পর্যন্ত যা কিছু আমি সৃষ্টি করেছি, এরা সবাই আমার রচিত নিয়ম-কানুন মেনে চলছে। এরা কেউ স্বাধীন নয়। যার জন্য যে বিধান তৈরি করেছি আমি সে বিধান তার উপর নিজেই চালু করে দিয়েছি। এ নিয়মের বিপরীত চলার ক্ষমতা কারো নেই।

৪। হে মানুষ! তোমাদের দেহের প্রতিটি অংশের জন্যই আমি বিধান তৈরি করেছি। তেমনিভাবে আমি তা চালু করে দিয়েছি। তোমাদের রক্ত চলাচলের নিয়ম, শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ম, খাদ্য হজম হবার বিধি, কথা বলা ও শুনার বিধান ইত্যাদি সবই আমার তৈরি। এর ব্যতিক্রম চলার কোন ক্ষমতা তোমাদের নেই।

৫। স্রষ্টা হিসেবে আমি সৃষ্টির জন্য যে বিধান দিয়েছি, তাই ঐ সৃষ্টির 'ইসলাম'। 'ইসলাম' শব্দের অর্থ আত্ম-সমর্পণ। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ, তারা, গাছপালা, নদী-নালা,

আকাশ-বাতাস, পাহাড়-পর্বত, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি সবই আমার বিধান মেনে চলছে। অর্থাৎ তারা তাদের ইসলাম পালন করে আত্মসমর্পণের প্রমাণ দিয়েছে। তাই এরা শান্তিতে আছে। 'ইসলাম' শব্দের আর এক অর্থ হলো 'শান্তি'। সৃষ্টি জগত স্রষ্টার বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করেই শান্তি ভোগ করছে।

৬। হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সমস্ত সৃষ্টির সেরা হিসেবে এক পৃথক মর্যাদা দিয়েছি। তোমাদের জড় দেহটা আসল মানুষ নয়। রূহ বা আত্মাই হলো প্রকৃত মানুষ। ভাল ও মন্দ সম্পর্কে যে চেতনা, তাই হলো মানুষ। এরই অপর নাম বিবেক। আমি আর কোন জীবকেই এ বিবেক শক্তি দিইনি। এ বিবেকের কারণেই তোমরা সেরা জীব।

৭। হে মানুষ! তোমাদেরকে আমি দুটো জিনিস দিয়েছি। একটি হলো বিশ্বজগত। আর একটি হলো এ জড়-জগতকে ব্যবহার করার উপযোগী একটি হাতিয়ার। মানব-দেহ হলো ঐ হাতিয়ার। দেহরূপ যন্ত্রের সাহায্যে সকল সৃষ্টিকে ব্যবহার করার এ অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র তোমাদেরকেই দিয়েছি। সৃষ্টি জগতে এ অধিকার ও ক্ষমতা আর কারো নেই।

৮। হে মানুষ! তোমরা যদি বিবেক দ্বারা চালিত হও, তাহলে কেউ তোমাদেরকে ভুল পথে নিতে পারবে না। কিন্তু যদি বিবেককে দাবিয়ে রেখে দেহের দাবী মেনে চল, তাহলে সৃষ্টি জগতের সেবা থেকে তোমরা বঞ্চিত হবে। যে জড় জগত তোমাদের কল্যাণের জন্য তৈরী করেছি, তা একমাত্র তখনই কল্যাণ দেবে, যখন তোমরা দেহের দাবীকে বিবেকের অধীনে রাখবে। এতে যদি তোমরা ব্যর্থ হও, তাহলে সমস্ত জড়-শক্তি অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং এ করুণ পরিণতির জন্য তোমরাই দায়ী হবে। তোমাদের হাতেই তোমরা ধ্বংস হবে।

৯। হে মানুষ! তোমরা যাতে বিবেককে শক্তিশালী করে দেহের প্রবৃত্তি ও দাবীকে নিয়ন্ত্রণে রাখার যোগ্যতা লাভ করতে পার এবং গোটা জড় জগতের সেবা ভোগ করতে পার, সে উদ্দেশ্যেই যুগে যুগে আমি মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় বিধান পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি। প্রত্যেক দেশে এবং প্রত্যেক যুগেই আমি এ উদ্দেশ্যে আদর্শ মানুষ পাঠিয়েছি। তাঁরা আমার ঐ সব বিধানকে পালন করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, আমার বিধান কিভাবে মানব সমাজকে সুখী ও শান্তিপূর্ণ বানাতে পারে। তাদেরকেই আরবীতে রাসূল বা নবী বলা হয়। এর অর্থ হলো বাণীবাহক। নবী ও রাসূলগণ আমার প্রেরিত বাণী মানুষকে পৌঁছায়ে গেছেন।

১০। আমার সৃষ্টিলোকের জন্য দু'রকমের ইসলাম রচনা করেছি। এক রকম ইসলাম হলো সৃষ্টির জন্য বাধ্যতামূলক। আমি নিজেই তা তাদের উপর কার্যকর করি। যেমন— মানবদেহ ও গোটা বিশ্বজগত। আর এ রকম ইসলাম হলো বিবেকসম্পন্ন মানুষের জন্য। আমি এ বিধান রচনা করলেও মানুষের উপর জোর করে তা চালু করিনি। মানুষকে এ বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়েছি। যার ইচ্ছা এ বিধান মেনে চলতে পারে, আর যার ইচ্ছা সে না-ও মানতে পারে। আমি মানুষকে মানতে বাধ্য করি না।

প্রথম ধরনের ইসলাম সকল সৃষ্টিই বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছে এবং সে বিধান অমান্য করার কোন ক্ষমতা তাদের নেই। তাই চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা ইত্যাদি যাবতীয় সৃষ্টি স্রষ্টার বিধান পালন করলেও এর জন্য তারা কোন পুরস্কার পাবে না। কারণ এ বিধান পালনের মধ্যে তাদের কোন কৃতিত্ব নেই। আর তাদের এ বিধান অমান্য করার কোন ক্ষমতা নেই বলে তাদের কোন রকম শাস্তি পাওয়ারও কারণ নেই।

হে মানুষ! পুরস্কার ও তিরস্কার শুধু তোমাদের জন্য। কারণ তোমাদের জন্য যে বিধান দেয়া হয়েছে, তা মানা ও না মানার ক্ষমতা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। তাই যারা নিজের ইচ্ছায় তা মেনে চলে, তাদের কৃতিত্বের জন্যই তারা পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। কারণ অমান্য করার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা মান্য করেছে। তেমনি মান্য করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যারা অমান্য করে, তারা শাস্তিরই যোগ্য।

১১। সৃষ্টি জগতের জন্য আমি স্রষ্টা হিসেবে বাধ্যতামূলক যে ইসলাম দিয়েছি, তা পাঠাবার জন্য রাসূল ও নবীর দরকার হয়নি। আমি নিজেই সে বিধান চালু করি। কিন্তু আমি মানুষের জন্য যে বিধান রচনা করেছি, তা রাসূলের মাধ্যমেই পাঠিয়েছি। আমার পক্ষ থেকে আমার প্রতিনিধি হিসেবে তাঁরা ঐ বিধানকে মানব সমাজে চালু করেছেন। যারা রাসূল থেকে সে বিধান শিক্ষা করে এবং তা মেনে চলে, তাদেরকেও আমার প্রতিনিধির মর্যাদা দান করি।

১২। আমি সব যুগে সব দেশেই আমার রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের কাছে আমার রচিত বিধান পাঠিয়েছি। যখনই মানুষ পরবর্তীকালে ঐ বিধানকে বিকৃত করে ফেলেছে, তখনই আবার আমি নতুন রাসূল পাঠিয়ে তার কাছে আবার বিশুদ্ধ বিধান পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার সর্বশেষ রাসূল হলেন মক্কার কুরাইশ বংশের আবদুল্লাহর ছেলে মুহাম্মদ (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। তাঁর কাছে পাঠানো আমার বিধানের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ রূপই হলো আল-কুরআন।

১৩। যেহেতু আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, মুহাম্মদই শেষ রাসূল এবং কুরআনই চূড়ান্ত বিধান, সেহেতু আমি এই কুরআনকে বিকৃত হতে দেব না। মুহাম্মদের কাছে ৬১০ সাল থেকে ৬৩৩ সাল পর্যন্ত ২৩ বছরে এই কুরআন যে ভাষায় অবতীর্ণ করেছি, হুবহু সে ভাষায়ই যাতে এ কুরআন মানুষের কাছে পৌছতে পারে, সে ব্যবস্থা আমিই করেছি।

১৪। এ কুরআনের সঠিক অর্থ বুঝাবার দায়িত্ব আমি মুহাম্মদকেই দিয়েছি। তিনি মানব সমাজে কুরআনের শিক্ষাকে বাস্তবে চালু করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। আমার বিধান মেনে চলবার জন্য যে সব লোক মুহাম্মদের সাথী হয়েছিলেন, তারা মুহাম্মদ থেকেই সব কিছু শিখেছিলেন।

আমার বিধান কিভাবে পালন করতে হবে, সে বিষয়ে আমি মুহাম্মদকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ আদর্শ নমুনা বানিয়েছি। তাঁকে তাঁর সাথীরা পূর্ণরূপে অনুসরণের চেষ্টা করেছেন বলে

আমি সার্টিফিকেট দিচ্ছি। সুতরাং যদি কেউ আমার কুরআনকে মেনে চলতে চায়, তাহলে তাদেরকে মুহাম্মদ ও তাঁর সাথীগণের জীবন থেকেই কুরআনকে বুঝতে হবে।

১৫। আমার রচিত বিধানের নাম রেখেছি ইসলাম এবং যারা এ বিধান মেনে চলে তাদের নাম দিয়েছি মুসলিম। ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ আর মুসলিম মানে যে আত্মসমর্পণ করল। আমি কাউকে বংশগত কারণে মুসলিম বলে স্বীকার করি না। এমনকি নবীর ছেলেও যদি আমার বিধান না মানে, তাহলে তাকে আমি বিদ্রোহী ঘোষণা করি। আমার নিকট সে ব্যক্তি মুসলিম হিসেবে গণ্য, যে আমার কুরআনকে ঐভাবে মেনে চলার চেষ্টা করে যেভাবে মুহাম্মদ ও তাঁর সাথীগণ মেনে চলেছেন।

১৬। যেহেতু আমার কুরআনের বাস্তব নমুনা শুধু মুহাম্মদের মধ্যেই পূর্ণরূপে পাওয়া যায়, সেহেতু মানব জাতির পক্ষে সঠিক পথ-নির্দেশ পাওয়ার সুযোগ করে দেবার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের কোন অংশ যাতে হারিয়ে না যায় তার ব্যবস্থাও করেছি। সুতরাং যারা ইসলামের সঠিক রূপ জানতে চায় এবং কুরআনের জীবন্ত নমুনা দেখতে চায়, তাদেরকে শেষ নবীর জীবনী ভাল করে জানতে হবে।

১৭। রাসূলের মাধ্যমে আমি যে বিধান মানব জাতির পার্থিব কল্যাণ ও শান্তি এবং পরকালীন মুক্তির জন্য পাঠিয়েছি, সে বিধান যারা নিষ্ঠার সাথে মেনে চলে, তারাই আমার অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য। আর যারা আমার বিধানের ধারক ও বাহক হওয়ার দাবীদার হয়েও বাস্তবে সে বিধান মেনে চলে না, তারাই আমার অভিশাপের উপযুক্ত।

আমার এ নীতি চিরন্তন। এ নীতির বাইরে আমি কোন মানব গোষ্ঠীর সাথে কখনও কোন আচরণ করি না।

১৮। আমার প্রেরিত বিধানের সর্বশেষ রূপ হলো কুরআন। এ কুরআনের শিক্ষাকে মানব জাতির নিকট সঠিকরূপে পৌঁছাবার যোগ্যতা হযরত মুহাম্মদের সাথীরা অর্জন করেছিল বলেই আমি তাদেরকে মানব জাতির পথ-প্রদর্শকের মর্যাদা দিয়েছিলাম। আমার ও মানব জাতির মাঝখানে তারাই মাধ্যমের ভূমিকা পালন করেছিল। আমি যা পছন্দ করি, তারা তা-ই মানব সমাজে চালু করেছিল এবং আমি যা অপছন্দ করি, তা সমাজ থেকে তারা উৎখাত করেছিল। যারা এ ভূমিকা পালন করে, তারাই হলো আমার সেনাবাহিনী। যতদিন তারা এ দায়িত্ব ঠিকমত পালন করে, ততদিনই আমি তাদের নেতৃত্ব ও প্রাধান্য বহাল রাখি এবং তখন তারা বিজয়ী শক্তি হিসেবে মানব জাতির নেতৃত্ব দান করে।

তাদের সংখ্যা যত কমই হোক এবং তাদের বিরোধী শক্তি যত বড়ই হোক, আমি তাদেরকে বিজয়ীর মর্যাদায়ই কায়েম রাখি। তাদের নৈতিক বল, চারিত্রিক প্রাধান্য ও মানবিক শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তাদের চেয়ে বেশি জনবল ও বস্তুশক্তিসম্পন্ন মানব গোষ্ঠীর উপর তারা বিজয়ী হতে থাকে।

১৯। যে গুণাবলীর দরুন আমি কোন জাতিকে এ বিজয় ও প্রাধান্য দিয়ে থাকি, তাদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যদি ঐসব গুণাবলী লোপ পায়, তাহলে তারা আমার নিকট অভিশপ্ত বলে গণ্য হয়। ফলে নেতৃত্বের মর্যাদা থেকে আমি তাদেরকে বঞ্চিত করি। তখন তারা জনবল ও বস্তুশক্তিতে যত বড়ই হোক তারা আমার অনুগ্রহ পাওয়ার আর যোগ্য থাকে না। আমার অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত হবার ফলে পৃথিবীতেও তারা অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করে। পরকালেও তারা শাস্তি ভোগ করবে। কারণ তাদের কাছে আমার বাণী ও বিধান থাকা সত্ত্বেও তারা মানব জাতিকে তা থেকে বঞ্চিত রেখেছে।

২০। আমি মানুষকে ভাল ও মন্দের যে চেতনা দিয়ে সৃষ্টি করেছি। এরই ফলে তার প্রতিটি চিন্তা, কথা ও কাজকে ঐ চেতনা দিয়েই বিচার করব। বিবেক-শক্তি প্রত্যেক মানুষকেই আমি দান করেছি। সে জেনে-শুনেই মন্দ কাজে লিপ্ত হয়। চুরি করা, ঘুষ খাওয়া, মিথ্যা বলা, ডাকাতি করা, হত্যা করা ইত্যাদি জঘন্য বলে জানা সত্ত্বেও মানুষ এসব কুকর্মে লিপ্ত হয়। সুতরাং সে যে অপরাধী, সে কথা তার বিবেকের নিকট অজানা নয়।

আমি তাকে এ চেতনা দান করেছি বলেই মৃত্যুর পর তার প্রতিটি বিবেক-বিরোধী কাজের জন্য আমি তাকে শাস্তি দেব। অন্যান্য জীব-জন্তুকে আমি এ চেতনা দান করিনি। তাই তারা সহজাত প্রবৃত্তি থেকে যা কিছু করে সে জন্য তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে না। এ বিবেক-শক্তির কারণেই মানুষ সেরা সৃষ্টির মর্যাদা পেয়েছে। অথচ এ বিবেকের বিরুদ্ধে চলার কারণেই মানুষ পশুর চেয়েও অধম বলে গণ্য হয়।

মানুষ যাতে তার যথার্থ মর্যাদা বজায় রেখে দুনিয়ায় শান্তি ও পরকালে মুক্তি পেতে পারে এবং নিজের প্রবৃত্তির তাড়নাকে পরাজিত করে বিবেকের কথামতো চলার যোগ্য হতে পারে তারই বিধি-বিধান কুরআনে দিয়েছি। হযরত মুহাম্মদ তাঁর জীবনে কুরআনকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তাই মানুষের প্রকৃত মর্যাদা অর্জন করতে হলে আদর্শ মানুষ মুহাম্মদ থেকেই তা শিখতে হবে।

২১। যারা পরকালের মুক্তির জন্য বৈরাগ্য জীবন অবলম্বন করে, তারা আমার দেয়া পার্থিব দায়িত্ব থেকে পালিয়ে মানব জীবনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করে। সংসারের বোঝা ফেলে দিয়ে এবং পার্থিব অগণিত দায়িত্বকে অবহেলা করে যারা ধার্মিক সেজে বেড়ায়, তারা মানব জাতির জন্য কোন আদর্শ হতে পারে না। সব মানুষ তাদের আদর্শ গ্রহণ করলে মানুষের অস্তিত্বই শেষ হয়ে যাবে।

ভাল মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার জন্য যারা সমাজ থেকে দূরে সরে থাকে, তারা মন্দকে জয় করে না। মন্দের নিকট পরাজয় স্বীকার করেই তারা সংসার বিরাগী হয়। চরিত্র জঙ্গলে সৃষ্টি হয় না। সমাজে যারা বসবাস করে, তাদের মধ্যে সৎ ও অসৎ উভয়

রকমের চরিত্রই পাওয়া যায়। যারা সমাজ ছেড়ে বনে-জঙ্গলে চলে যায়, তাদের চরিত্র সৎ বা অসৎ কোনটাই নয়। তাদের চরিত্র বলে কোন জিনিসই নেই। সমাজে যে বাস করে, সে হয় সত্যবাদী আর না হয় মিথ্যাবাদী। কারণ তাকে কথা বলতেই হয়। সত্য বলতে পারলে সত্যবাদী বলে সে গণ্য হয়। কিন্তু যে সমাজেই থাকে না, তার তো কথা বলারই সুযোগ নেই। সুতরাং সে মিথ্যাবাদী না হলেও তাকে সত্যবাদী বলারও সুযোগ নেই।

সংসারের ঝামেলায় থেকে এবং মানব সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকার কারণে মন্দ থেকে বেঁচে থাকা কঠিন বলেই তো এর জন্য আমি পুরস্কার দেব। কিন্তু পার্থিব দায়িত্ব থেকে যারা পালিয়ে বেড়ায়, তাদেরকে এ অপরাধের দরুন কঠিন শাস্তি দেব। কুরআনে মানুষকে সৎ ও যোগ্য সামাজিক জীব হবার শিক্ষাই আমি দিয়েছি। ভাল মানুষ হবার জন্য দুনিয়া ত্যাগ করতে হবে না, কুরআনকে মেনে চলতে হবে।

জামায়াতে ইসলামীর মৌলিক ২–দফা

এ দেশে যতগুলো রাজনৈতিক সংগঠন আছে, তাদের সাথে জামায়াতে ইসলামীর দুটো ক্ষেত্রে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আর এ দুটোই জামায়াতে ইসলামীর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

১। প্রথমত, জামায়াতে ইসলামী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের সর্বস্তরে যে সুবিচারমূলক, পক্ষপাতশূন্য ও ভারসাম্যপূর্ণ বিধি-বিধান দরকার তা কোন মানুষের পক্ষেই রচনা করা সম্ভব নয়। তাই বিশ্ব স্রষ্টার রচিত বিধান হিসাবে জামায়াতে ইসলামী কুরআনকেই মানব জাতির জন্য একমাত্র কল্যাণকর জীবন-ব্যবস্থা বলে বিশ্বাস করে। মানব রচিত বিধানের ত্রুটি-বিচ্যুতি এ বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছে। শুধু ভাবাবেগ–তাড়িত অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তিতে জামায়াত এ সিদ্ধান্তে পৌছেনি। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্যের ভিত্তিতে ও বলিষ্ঠ যুক্তির মাধ্যমেই এ মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আধুনিক বিশ্বের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদগণের জোরালো সাহিত্য এ বিষয়ে যে কোন চিন্তাশীল লোককে প্রভাবিত না করে পারে না। অবশ্য যারা প্রবৃত্তির দাসত্ব করাকেই জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে অথবা অন্ধভাবে কোন মতবাদ বা জীবন-দর্শনকে গ্রহণ করে বসেছে তাদের কথা আলাদা। তারা যদি এ সব উন্নত সাহিত্য অধ্যয়ন করে তুলনামূলকভাবে বিচার করতেন, তাহলে অবশ্যই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে পারতেন।

আমাদের মাতৃভাষায় ঐ সব মূল্যবান সাহিত্যের বিপুল সমাবেশ রয়েছে। সুতরাং জামায়াতে ইসলামী জ্ঞানের ভিত্তিতে আন্দোলন চালাচ্ছে। এ আন্দোলন শ্লোগান সর্বস্ব নয়।

২। দ্বিতীয়ত, জামায়াতে ইসলামী এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে, সৎ, চরিত্রবান, নিঃস্বার্থ ও মানব দরদী লোকদের নেতৃত্ব ছাড়া ভাল আইনও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। তাই জামায়াত অন্যান্য দলের মতো রাজনৈতিক প্রভাব ও অর্থনৈতিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তিকে নেতৃত্ব করার সুযোগ দেয় না। জামায়াতের সাংগঠনিক পদ্ধতিই এমন যে, যারা সৎ বা সৎ হতে ইচ্ছুক তাদের পক্ষেই সংগঠনের সদস্য পদ লাভ করা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে এ সংগঠন হলো উন্নত চরিত্র গঠনের এক বিরল আন্দোলন।

উন্নত চরিত্রবান লোক রেডিমেড পাওয়া যায় না। বিদেশ থেকে আমদানী করার পণ্যও এটা নয়। এ সমাজ থেকেই ঐ সব লোক সংগ্রহ করা হয়, যারা চরিত্রবান নেতৃত্ব কায়েম করতে আগ্রহ রাখে। বিশেষ সাংগঠনিক প্রক্রিয়া ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই চরিত্র সৃষ্টির এ আন্দোলন এগিয়ে চলছে। আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন ছাড়া দুনিয়ার শান্তি ও পরকালের মুক্তি সম্ভব নয় বলে কুরআন সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে।

জামায়াতে ইসলামী এ মৌলিক ২- দফার ভিত্তিতেই এ দেশে ইসলামী বিপ্লব সাধন করতে চায়। জ্ঞান বিস্তার ও চরিত্র গঠনের এ আন্দোলন জামায়াতে ইসলামীর একক বৈশিষ্ট্য। ইসলামের নামে রাজনীতি করার জন্য দলের অভাব এ দেশে নেই। কিন্তু বাস্তবে ইসলামী জীবনাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এ দুটো বৈশিষ্ট্য অন্য কোথাও তালাশ করে পাওয়া সহজ নয়।

আমাদের সমাজে একটা ধারণা আছে যে, সৎ লোকগুলো অযোগ্য। আর যোগ্য লোকেরা অসৎ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ কথা সত্য বলেই এ ধারণা সমাজে সৃষ্টি হয়েছে। একই ব্যক্তির মধ্যে সততা ও যোগ্যতার সমাবেশ ব্যতীত সমাজের উন্নতি হতে পারে না। কারণ যোগ্যতা ছাড়া সততা অথর্ব, আর সততা ছাড়া যোগ্যতা বিপজ্জনক। যোগ্য লোক অসৎ হলে সে যোগ্যতার সাথে অসততাই করবে। আর সৎ লোক অযোগ্য হলে সে সততাটুকুও রক্ষা করতে পারবে না। তাই জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন যোগ্য লোকদেরকে সৎ এবং সৎ লোকদেরকে যোগ্য বানাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। জামায়াতের এ বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এ দেশে এর কোন তুলনা আছে কিনা তা সবাই বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

যে রাষ্ট্রে আল্লাহর রচিত আইন চালু করার উদ্দেশ্যে সৎ ও চরিত্রবান লোক দ্বারা সরকার গঠিত হয়, তাকেই ইসলামী রাষ্ট্র বলা হয়। মানুষের স্রষ্টা নিরপেক্ষভাবে সব মানুষের জন্য যে সব অধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সে সব অধিকার ঠিকমতো বহাল করার জন্যই এ জাতীয় রাষ্ট্রের দরকার। কুরআনে সুদকে শোষণ ও জুলুম বলা হয়েছে। তাই সরকারী দায়িত্ব হলো সুদকে সমাজ থেকে উৎখাত করে মানুষকে

শোষণমুক্ত করা। রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক তার মৌলিক মানবিক প্রয়োজন থেকে যেন বঞ্চিত না থাকে, সে দিকে লক্ষ্য রাখা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব। যে সরকার এ দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করে, তাকে চুরি ও ডাকাতি বন্ধ করার জন্য কঠোর শাস্তি দেবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই অভাবের কারণে কেউ চুরি করলে শাস্তি দেবার আইন কুরআনে নেই।

রাসূলের যুগে এবং পরবর্তী ন্যায়পরায়ণ খলীফাদের শাসনকালে রাষ্ট্রের মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের যাবতীয় মানবাধিকার সমানভাবে সবাই ভোগ করতে পেরেছে। কুরআনের আইন চালু করার মাধ্যমেই সে সব অধিকার বহাল করা সম্ভব। এ দায়িত্ব পালনের জন্যই ইসলামী রাষ্ট্র প্রয়োজন। জামায়াতে ইসলামী এ জাতীয় রাষ্ট্রই কায়েম করতে চায়।

কিন্তু এ কাজটি এত সহজসাধ্য নয়। এর জন্য প্রয়োজন ইসলামী সরকার। ইসলামী রাষ্ট্র চালাবার যোগ্য লোক না হলে ইসলামী সরকার গঠনের কোন উপায় নেই। যারা কুরআনে বর্ণিত উন্নত চরিত্রের অধিকারী একমাত্র তারাই এ জাতীয় সরকার গঠন করতে সক্ষম। তাই জামায়াতে ইসলামী উন্নত মানের চরিত্র সৃষ্টির অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে এ দেশে সৎ ও চরিত্রবান লোকেরই সবচেয়ে বেশি অভাব। কিন্তু এ সমাজে যারা জামায়াতে ইসলামীর সদস্য পদ লাভ করেছে, তাদের চরিত্র যাচাই করে দেখলে এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হবে যে, সমাজে তারা ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ। এ অবস্থাটা আপনা-আপনিই হয়ে যায়নি। এর জন্য জামায়াতকে রীতিমতো সাধনা করতে হচ্ছে। এ জাতীয় লোকদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব না আসা পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য বাস্তবে সমাজে পাওয়া যেতে পারে না।

গভীরভাবে বিবেচনা করুন

মানুষের সংজ্ঞা নিয়ে যত মত পার্থক্যই থাকুক, মানুষ যে নৈতিক জীব-এটাই প্রধান কথা। নীতিবোধ ও ভাল-মন্দ বিচার করার চেতনাই মানুষকে মানুষ পদবাচ্য বানিয়েছে। এটাকেই মনুষ্যত্ব বলে। যার মধ্যে এর অভাব দেখা যায়, সে আকারে মানুষ হলেও প্রকারে তাকে পশুই বলা হয়। কুরআন তাকে পশুর চাইতেও অধম বলেছে। কারণ পশুর বিবেক–শক্তি নেই। মানুষের বিবেক থাকা সত্ত্বেও যদি নীতিহীন হয়, তাহলে সে পশুর চেয়ে অধমই বটে।

ধর্ম মানুষকে নৈতিক উন্নয়নের পথই দেখায়। কিন্তু ধর্মকে যখন ব্যক্তি-জীবনে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তখন সমাজ-জীবনে ধার্মিকতাকে পরিত্যাজ্য মনে করা হয়। তাই নৈতিক বাঁধনও সেখানে থাকে না। কুরআন এ কথাই বার বার তাগিদ দিয়েছে যে, গোটা জীবনই নৈতিক বন্ধনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। আজ আমাদের দেশে নীতি ও

নৈতিকতার বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, হোটেল, প্রদর্শন ইত্যাদি যেভাবে উঠে– পড়ে লেগেছে, তাতে মানবতার অপমৃত্যু ছাড়া আর কী বলা যায়?

ধর্মহীন রাজনীতি, নীতিহীন অর্থনীতি, ভোগবাদী সংস্কৃতি, পয়সাওয়ালাদের অপকর্ম এবং গরীবদের অসহায়ত্ব এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে, পুরাতন সামাজিক বন্ধন আর মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারছে না। নীতিহীনতার প্লাবন ঐ বন্ধনকে ভেঙ্গে দিয়েছে।

এর পরিণাম সবারই ভেবে দেখা দরকার। এখানে হিন্দু-মুসলিমে কোন প্রভেদ নেই। সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের এ চরম সংকটে আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের আমরা কী অবস্থায় রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নেব, তা ভাববার বিষয়। এসব বিষয়কে যারা ভাববার যোগ্য মনে করেন, তারাই জামায়াতে ইসলামীর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম। যারা বস্তুজগতকে যথাসম্ভব ভোগ করে গতানুগতিকভাবে জীবনটাকে বিলিয়ে দেয়া ছাড়া উচ্চতর কোন চিন্তা-ভাবনার ধার ধারেন না, তাদের কাছে আমার কোন বক্তব্য নেই। তাদের কাছে জামায়াতে ইসলামীর কোন মূল্য থাকার কথা নয়।

রাজনীতির ময়দানে সততা, নৈতিকতা, মনুষ্যত্ব ও নিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা যারা অনুভব করেন, তাদেরকে জামায়াতে ইসলামীর দিকে আকৃষ্ট হতেই হবে। কূটনীতির নামে নীতিহীনতা রাজনীতিতে নাকি দূষণীয় নয়। প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা বা কমপক্ষে ঘায়েল ও নাজেহাল করার জন্য যে-কোন চালবাজি ও ধোকাবাজি নাকি রাজনৈতিক যোগ্যতার প্রমাণ। এ জাতীয় পাশবিক রাজনীতিকে উৎখাত করে মানবিক রাজনীতি চালু করাই জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম লক্ষ্য। যারা এ লক্ষ্যের সাথে একমত জামায়াতে ইসলামী তাদেরই প্রিয় সংগঠন ও আন্দোলন।

অমুসলিমদের সম্পর্কে দরদপূর্ণ ভাবনা

ছাত্র-জীবনে আমার হিন্দু সহপাঠী বন্ধুদের সম্পর্কে আমার মনে প্রশ্ন জাগতো যে, ওরা কেন মুসলমান নয়? আমার মতোই যদি ওরা মুসলমানের ঘরে জন্ম নিতো, তাহলে নিশ্চয়ই ওরা হিন্দু হতো না। সাথে সাথে এ প্রশ্নও সৃষ্টি হলো যে, আমি যদি হিন্দুদের ঘরে জন্ম গ্রহণ করতাম, তাহলে আমিও তো হিন্দু হতাম। স্রষ্টাই যদি কাউকে হিন্দু ও কাউকে মুসলিম হতে বাধ্য করে থাকেন, তাহলে এর জন্য কে দায়ী হবে?

এসব প্রশ্নের কোন জওয়াব আমার কাছে ছিল না। পরবর্তীকালে ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনার সুযোগ পাওয়ার পর বিস্মিত হয়ে উপলব্ধি করলাম যে, জন্মগতভাবে মুসলিম হিসেবে ইসলামকে যতটুকু বুঝতাম তা প্রকৃত ইসলাম নয়। সেটুকু ইসলামের একটা বাহ্যিক খোলস মাত্র। ছাত্র-জীবনে যে প্রশ্নের জওয়াব পাইনি এর সন্তোষজনক জওয়াব তখন পেলাম। গভীর প্রত্যয়ের সাথে অন্তর দিয়ে অনুভব করলাম যে, ইসলাম জগত ও জীবন সম্পর্কে এমন বিশেষ এক দর্শন ও ধারণার নাম, যা জন্মগতভাবে আপনা-

আপনিই অর্জন করা সম্ভব নয়। ইসলামী জীবনধারা বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত। যার ইচ্ছে হয় বুঝে-শুনেই তা গ্রহণ করতে পারে। ইচ্ছে না হলে জোর করে এটা গ্রহণ করাবার বিষয় নয়।

তাই দেখা যায় যে, মুসলমনের ঘরে জন্ম নিলেও অধিকাংশ মুসলমানের জীবনেই ইসলামের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না। অথচ জন্মগতভাবে অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও এমন বেশ কিছু লোকের সাক্ষাৎ আমি এদেশে ও বিদেশে পেয়েছি, যারা সত্যিকারভাবে ইসলামকে বুঝেই ক্ষান্ত হননি, বাস্তব জীবনে তারা মুসলিমদের জন্যও অনুপ্রেরণার উৎস হয়েছেন। এতেই প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম এমন কোন সম্পদ নয়, যা পিতা-মাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই অর্জন করা যায়। আদর্শ মুসলিমের সন্তান বলেই আপনিতেই কেউ প্রকৃত মুসলিম হতে পারে না। পিতা-মাতা সন্তানকে শৈশবকালে সত্যিকার মুসলিমরূপে গড়ে তুলবার চেষ্টা করলেও কৈশোর ও যৌবনকালে স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করে নতুন করে সিদ্ধান্ত নেয়াই স্বাভাবিক। তখন দেখা যায় যে, কেউ বুঝে-শুনে নতুনভাবে সচেতন মুসলিম হয়েই থাকার সিদ্ধান্ত নেয়, আবার কেউ হয়তো শৈশবে শেখান ধার্মিক জীবনকে সচেতনভাবেই ত্যাগ করে। এভাবে দেখা যায় যে, মানুষ বাস্তব জীবনে নিজের স্বাধীন সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই চলে। বাল্যকালের শিক্ষা ও অভ্যাস সকলের জীবনেই স্থায়ী হওয়া মোটেই নিশ্চিত নয়।

গরুর সন্তান গরুই হয়। পাখীর বাচ্চা গরু হয় না। এটা প্রকৃতির আইন। এটা ইচ্ছাধীন নয়। তেমনি মানুষের বাচ্চা ঘোড়া হয় না। বানরের সন্তানও মানুষ হয় না। জন্মগতভাবে মানুষের বাচ্চা আকারে মানুষই হয়। কিন্তু গুণগত দিক দিয়ে মন্দ লোকের সন্তান ভালো হতে পারে আবার ভাল লোকের সন্তান মন্দ হয়ে যেতে পারে। কোন হেড মাস্টারের ছেলে লেখা-পড়া না শিখলে উত্তরাধিকার সূত্রে আপনিতেই হেড মাস্টার বলে গণ্য হবে না। কোন অধ্যাপকের সন্তান অশিক্ষিত হলে জন্মগতভাবে সে অধ্যাপক হতে পারবে না। ঠিক তেমনি মুসলিম হওয়াটা নিতান্তই গুণগত ব্যাপার। এটা হেড মাস্টার বা অধ্যাপক হবার মতো অর্জন করে নেবার জিনিস। মুসলিমের ঔরসে জন্ম নেবার ফলেই মুসলিম চরিত্র বিনা চেষ্টায় অর্জিত হবেনা।

এ মৌলিক কথাটি বুঝবার পর আমাদের দেশের অমুসলিম নাগরিকদের কথা গভীরভাবে ভাবতে লাগলাম। ইসলামকে সঠিক ভাবে বুঝবার সুযোগ পেলে তাদের মধ্যে অনেকেই গুণগত দিক দিয়ে মুসলিম হবার প্রয়োজন মনে করতে পারেন। না জানা ও না বুঝার কারণে যারা ইসলাম সম্পর্কে সঠিকভাবে বিবেচনা করারই সুযোগ পেলেন না, তাদের জন্য আমাদের মতো সচেতন মুসলিমদেরকেই স্রষ্টার নিকট দায়ী হতে হবে। এ আশংকাই আমাকে বাধ্য করেছে এ বইটি লেখার জন্য। হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও উপজাতি– আমার প্রিয় স্বদেশবাসীর কাছে আমার আকুল আবেদন যে,

আপনাদের উদ্দেশে রচিত আমার মনের আন্তরিকতাপূর্ণ আবেগকে উপেক্ষা না করে নিরপেক্ষ মন নিয়ে আমার কথাগুলো বিবেচনা করবেন।

আমাদের সবাইকে একদিন মরতে হবেই। এ জীবনটা আমরা যেভাবে কাটাব, তারই ফল পরকালে ভোগ করতে হবে। সুতরাং ব্যাপারটা মোটেই অবহেলা করার মতো নয়। দুনিয়ার জীবনে যদি ভুল পথে চলতে থাকি, তাহলে পরকালে সুফল পাওয়ার আশা করা একেবারেই বোকামি।

ঘটনাচক্রে আমি কোন অসৎ লোকের ঘরে পয়দা হয়ে গেছি বলেই কি সৎ হবার চেষ্টা করা আমার দায়িত্ব নয়? কোন অশিক্ষিত লোকের ঔরসে জন্মেছি বলেই কি শিক্ষিত হবার চেষ্টা করা উচিত নয়? এ যুক্তির ভিত্তিতেই প্রত্যেককে চিন্তা করতে হবে যে, কোন হিন্দু বা খ্রিস্টান পিতা-মাতার ঘরে আমার বাল্যকাল কেটেছে বলে পরবর্তী বয়সে কি অন্ধভাবেই পিতৃধর্ম মেনে চলব? ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের পর যদি সচেতনভাবে পিতৃধর্মে থাকাই বিবেকের দাবি হয়, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।

ধার্মিকতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব

ধর্মের ভিত্তিতে যে মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে আন্তরিক ভালবাসা ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে এর প্রমাণ আমার জীবনেই পেয়েছি। ১৯৫০ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজে যখন রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করি, তখন সিনিয়র অধ্যাপকদের বেশির ভাগই হিন্দু ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু ও মুসলিম সকল অধ্যাপকের সাথেই পরিচয় হলো। আমি যেহেতু ধর্ম নিয়ে আলাপ-আলাচনা করা বেশি পছন্দ করতাম, সেহেতু অধ্যাপকগণের মধ্যে যারা ধর্মচর্চা করতে আগ্রহী ছিলেন, তাদের সাথে আমার সম্পর্ক অন্যদের তুলনায় একটু বেশি ঘনিষ্ঠ হতে লাগল। বলা বাহুল্য যে, কয়েকজন মুসলিম অধ্যাপকের সাথেই প্রথমে এ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। টিচার্স কমনরুমেও মাঝে মাঝে অবসর সময়ে ধর্ম, নৈতিকতা ও চরিত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে অধ্যাপকদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হতো। আমরা ছাত্রদেরকে পড়াই যাতে তারা ডিগ্রি পেতে পারে। কিন্তু তাদেরকে চরিত্রবান বানাবার কোন চেষ্টা করা কি আমাদের উচিত নয়? এ জাতীয় আলোচনা উঠলেই ধর্মের কথা এসে যেতো। কারণ চরিত্র গঠনের জন্যই ধর্মের প্রয়োজন। ধর্মই এ কথা শেখায় যে, আমার একজন স্রষ্টা আছেন। তিনি আমাকে অন্যান্য পশুর মতো বিবেকহীন জীব বানাননি। ভাল ও মন্দের বিচারবোধ আমাকে দিয়েছেন। আমার এ নৈতিক চেতনা অনুযায়ী আমি চলছি কিনা, সে কথা আমার স্রষ্টা নিশ্চয়ই আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করবেন। তা না হলে আমাকে বিবেক-শক্তি দেবার যৌক্তিকতা থাকে না। ধর্মের এ চেতনাই উন্নত নৈতিক চরিত্রের উৎস।

ধর্মই মানুষের মধ্যে এ দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে যে, দুনিয়ার জীবনে ভাল কাজ করলে এবং বিবেকের দাবী অনুযায়ী চললে মৃত্যুর পর এর ভাল ফল অবশ্যই পাওয়া যাবে।

তেমনি বিবেকের বিরুদ্ধে জীবন যাপন করার কুফলও পেতে হবে। এটা যুক্তি ও কমনসেন্সেরই দাবি। ভাল ও মন্দ কাজের একই রকম পরিণতি হতে পারে না।

ধর্মের এ সব মৌলিক বিষয় নিয়ে আমি ছাত্রদের মধ্যেও চর্চা করতাম। দুপুরের পর ৪৫ মিনিট বিরতি চলাকালে আমি ধর্মালোচনার জন্য আলাদা একটা ক্লাসে ছাত্রদের নিয়ে প্রায়ই বসতাম। ছেলেরাও আমাকে ধর্মীয় ব্যাপারে অনেক রকম প্রশ্ন করতো। আমি তাদেরকে যুক্তি দিয়ে ধর্মের কথা বুঝাবার চেষ্টা করতাম।

কলেজের রুটিনের বাইরে টিচার্স কমনরুমে বা বিরতির সময় ক্লাসে ছাত্রদের মধ্যে আমার ধর্মচর্চা অধ্যাপকদের মধ্যে সবাই সমান চোখে দেখতেন না। মুসলিম অধ্যাপকদের মধ্যেও বেশির ভাগই এ সব আলোচনায় উৎসাহ দেখাতেন না। হিন্দু অধ্যাপকগণের মধ্যে বাবু গৌর গোবিন্দ গুপ্ত নামে দর্শন বিভাগের সিনিয়র ও প্রৌঢ় একজন অধ্যাপক এ তৎপরতায় আমাকে উৎসাহ দিতেন। আমি এতে বিস্ময় বোধ করতাম। ধীরে ধীরে তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগল। তিনি আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে ধর্মীয় আলাপ করা শুরু করলেন।

আমি তাঁর মধ্যে এমন এক খোদা-প্রেমিক মন পেলাম যে, আমাদের মধ্যে বয়সের তারতম্য সত্ত্বেও গভীর বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়ে গেল। তিনি আমাকে রামকৃষ্ণ পরমহংসের চরিতামৃত শুনাতেন যাতে এমন সব ভাব প্রকাশ পেতো, যা আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের অনেক বাণীর সাথে মিলে যেতো। আমি যখন কুরআন থেকে বা রাসূলের হাদিস থেকে অনুবাদ করে শুনাতাম, তখন তাঁর মধ্যেও এমন আবেগ সৃষ্টি হতো যে, তাঁর চোখে পানি এসে যেতো।

মাঝে মাঝে আমাদের দু'জনের বৈঠক দীর্ঘ সময় ধরে চলতো এবং ধর্মীয় আলোচনা উভয়কে সমানভাবে তৃপ্তি দিতো। তাঁর সাথে আমার এ ভালবাসার সম্পর্ক একমাত্র ধর্মের কারণেই গড়ে উঠেছিল। এ জাতীয় সম্পর্ক যে কত গভীর ও আন্তরিকতাপূর্ণ হয়, তার সাক্ষী আমি নিজেই। পার্থিব স্বার্থের ভিত্তিতে এমন পবিত্র সম্পর্ক হতেই পারে না।

রংপুর কারমাইকেল কলেজ অবিভক্ত বাংলার ৫টি বড় কলেজের একটি ছিল। বিরাট এলাকা দখল করে আছে কলেজের বিল্ডিং, ছাত্রদের হোস্টেল ও অধ্যাপকদের বাসা। গৌর বাবু বড় বাসাগুলোর একটায় থাকতেন। তার মধ্যে একটা কামরা পূজার জন্য নির্ধারিত ছিল। আমি তাঁর বৈঠকখানায় যখনই যেতাম তাঁকে হয় পাঠরত পেতাম অথবা পূজার ঘর থেকে বের হতে দেখতে পেতাম। তাঁর ধীর-স্থির শান্ত সৌম্য চেহারা আমার মনে শ্রদ্ধারই আসন করে নিয়েছিল।

চাকরী থেকে গৌর বাবু অবসর গ্রহণ করে যখন কলেজের বাসা ছেড়ে দেবার প্রস্তুতি নিলেন, তখন আমাকে আবেগের সাথে বললেন, "এ বাসায় দীর্ঘ ৩৩ বছর কাটিয়েছি। এ বাসা তৈরি হবার সময় থেকেই আমি এখানে আছি। এখানে কোন অধার্মিক লোক বাস করেনি। আমার পর এখানে যদি কোন অধার্মিক লোক বসবাস করে, তাহলে আমার মনে ব্যথা লাগবে। তাই আমার যাবার আগেই দেখে যেতে চাই যে, আপনার

মতো লোক যেন এখানে থাকে। আপনার যদি এ বাসায় আসতে আপত্তি না থাকে তাহলে আমি প্রিন্সিপালের কাছে আমার বিদায়কালীন আবেদন জানাব যাতে তিনি আপনার নামে এ বাসাটা 'এলট' করে দেন।"

তাঁর আবেগ–ভরা, স্নেহ-মাখা ও হৃদয়– নিংড়ানো কথাগুলো আমাকে রীতিমতো অভিভূত করল। আমি নতুন অধ্যাপক এবং আমার পরিবার ছোট বলে এত বড় বাসা পাওয়ার আশা করিনি। কিন্তু শ্রদ্ধেয় গৌর বাবুর আবদার প্রিন্সিপাল সাহেব কিছুতেই ফেলতে পারলেন না।

যদিও এ ঘটনা ও বিষয়টা একান্তই ব্যক্তিগত, তবুও ঘটনাটি থেকে এ ধারণা আমার অন্তরে বদ্ধমূল হয়েছে যে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেও ধর্মের ভিত্তিতেই বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। অপরদিকে এক ধর্মের অন্তর্ভুক্ত দু'জনের মধ্যেও ধার্মিকতার অভাবে শত্রুতা থাকতে পারে।

তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান দেশবাসীর মধ্যে যারা ধর্মকে ভালবাসেন এবং মানুষের নৈতিক উন্নয়নের জন্য ধর্মের গুরুত্ব অনুভব করেন, তারা রাজনৈতিক অংগনেও অধার্মিক নেতৃত্ব পছন্দ করবেন না। সৎ ও চরিত্রবান নেতৃত্ব ব্যতীত দেশের উন্নতি হতে পারে না। জামায়াতে ইসলামী ঐ নেতৃত্বই গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে।

রাজনৈতিক ময়দানে এদেশের অমুসলিমদের মধ্যে যারা ধর্মের এ গুরুত্ব অনুভব করেন, তাদের পক্ষে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করার পথে কোন বাধা থাকার কথা নয়। তাঁরা ধর্মীয় ব্যাপারে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান থেকেই জামায়াতে ইসলামীর সংগঠনে যোগদান করে এর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে শরীক হতে পারেন। অমুসলিম নাগরিকগণকে জামায়াতে ইসলামীর সংগঠনে যোগদান করার সুযোগ দেবার যে ফরম রয়েছে, তা আশা করি তাঁদের নিকট সহজেই গ্রহণযোগ্য হবে।

জামায়াতে ইসলামীকে জানতে হলে

জামায়াতে ইসলামীকে সঠিকভাবে যারা জানার আগ্রহ পোষণ করেন, তাদেরকে নিম্নরূপ পরামর্শ দিতে চাই ঃ

১. জামায়াত যে জীবন-দর্শনে বিশ্বাসী, সে সম্পর্কিত কয়েকটি বই পড়া দরকার। যেমন– শান্তিপথ, ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা, ইসলাম ও জাহেলিয়াত, ইসলাম পরিচিতি, একমাত্র ধর্ম, লন্ডন ভাষণ ও ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার, Islamic Law & Constitution.

২. জামায়াতের সাংগঠনিক দিককে বুঝবার জন্য কযেকটি পুস্তিকা দেখা প্রয়োজন। যেমন– বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী, জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য, জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র ও সংগঠন পদ্ধতি।

৩. জামায়াতের ব্যাপারে যে-সব প্রশ্ন মনে জাগে, তা জামায়াতের কোন দায়িত্বশীলের কাছে জিজ্ঞেস করুন যাতে সন্তোষজনক উত্তর পেতে পারেন।

যোগাযোগের ঠিকানা

কেন্দ্রীয় অফিস
৫০৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

ঢাকা মহানগরী
৪৮/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৫৬৬৬৫৮-৫৯

চট্টগ্রাম মহানগরী
৪৩, দেওয়ানজী পুকুর লেন
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম
ফোন ঃ ০৩১-৬১৯১৫৬

খুলনা মহানগরী
আল ফারুক সোসাইটি
কে. ডি. এ. আউটার বাইপাস রোড
সোনাডাঙ্গা, খুলনা-৯১০০
ফোন ঃ ০৪১-৭২৩৯৬৭

রাজশাহী শহর
ই-৪০৮, মদিনা লজ
হাতেম খান, রাজশাহী-৬০০০
ফোন ঃ ০৭২১-৭৭২৫৭৯

বরিশাল শহর
কুসুমালয়
ব্রাউন কম্পাউন্ড
বরিশাল-৮২০০
ফোন ঃ ০৪৩১-৫৩৭০১

সিলেট শহর
আল আমীন লাইব্রেরী
১৫/২ কুদরতুল্লাহ মার্কেট
সিলেট-৩১০০
ফোন ঃ ০৮২১-৭২২০৩৪

ডাকযোগের ঠিকানা

১. কেন্দ্রীয় অফিস
৫০৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

২. ঢাকা মহানগরী
৪৮/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

৩. চট্টগ্রাম মহানগরী
৪৩, দেওয়ানজী পুকুর লেন
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম

৪. খুলনা মহানগরী
আল ফারুক সোসাইটি
কে. ডি. এ. আউটার বাইপাস রোড
সোনাডাঙ্গা, খুলনা-৯১০০

৫. রাজশাহী শহর
ই-৪০৮, মদিনা লজ
হাতেম খান, রাজশাহী-৬০০০
ফোন ঃ ০৭২১-৭৭২৫৭৯

৬. বরিশাল শহর
কুসুমালয়
ব্রাউন কম্পাউন্ড
বরিশাল-৮২০০
ফোন ঃ ০৪৩১৫৩৭০১

৭. সিলেট শহর
আল আমীন লাইব্রেরী
১৫/২ কুদরতুল্লাহ মার্কেট
সিলেট-৩১০০

● যে কোন জিলা বা উপজিলা কেন্দ্রে "জামায়াতে ইসলামী অফিস" লিখে চিঠি দিলে পৌঁছবে।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

অমুসলিম সহযোগী সদস্য ফরম

কোন অমুসলিম নাগরিক জামায়াতে ইসলামীর সংগঠনে যোগদান করতে ইচ্ছুক হলে তাকে একটি মুদ্রিত ফরম পূরণ করতে দেয়া হয়। উক্ত ফরমে পাঁচটি কথা রয়েছে। যারা এ কয়টি কথার সাথে একমত হন, তারাই সহযোগী সদস্য হিসাবে গণ্য হন। উক্ত পাঁচটি কথা নিম্নরূপ ঃ

১. আমি মনে–প্রাণে বিশ্বাস করি যে, দেশে শান্তি ও শৃংখলা কায়েম করিতে হইলে শাসন-ক্ষমতা ধার্মিক, চরিত্রবান ও নিঃস্বার্থ লোকদের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে।

২. জামায়াতে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে এমন ধরনের সৎ ও যোগ্য লোকের শাসন কায়মের চেষ্টা করিতেছে বলিয়া এই সংগঠনকে আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন করি।

৩. জামায়াতে ইসলামীর পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকার পরিচালিত হইলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত জীবন-যাপন করিতে পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

৪. রাজনৈতিক শান্তি ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বাংলাদেশকে কল্যাণ রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে আমি জামায়াতে ইসলামীর সহিত সহযোগিতা করিব।

৫. আমার জীবনকে নৈতিক দিক দিয়া উন্নত করিবার জন্য আমি সর্বদা চেষ্টা করিব।

লেখকের অন্যান্য বই

১. কুরআন বুঝা সহজ
২. আমপারা (তাফহীমুল কুরআনের সার সংক্ষেপ)
৩. ২৯ পারা (তাফহীমুল কুরআনের সার সংক্ষেপ)
৪. সীরাতুন্নবী সংকলন
৫. নবী জীবনের আদর্শ
৬. ইসলামে নবীর মর্যাদা
৭. বিশ্বনবীর চরিত্র গঠন পদ্ধতি
৮. বিশ্বনবীর জীবনে রাজনীতি
৯. রাহমাতুললিল আলামীন
১০. ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন
১১. ইকামাতে দ্বীন
১২. ইসলামী আন্দোলন-সাফল্য ও বিভ্রান্তি
১৩. বাইয়াতের হাকীকত
১৪. রুকনিয়াতের দায়িত্ব
১৫. জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য
১৬. বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী
১৭. গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী
১৮. বাংলাদেশের ভবিষ্যত ও জামায়াতে ইসলামী
১৯. আমার দেশ বাংলাদেশ
২০. বাংলাদেশের রাজনীতি
২১. বাংলাদেশে আদর্শের লড়াই
২২. পলাশী থেকে বাংলাদেশ
২৩. ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান
২৪. আধুনিক পরিবেশে ইসলাম
২৫. কিশোর মনে ভাবনা জাগে
২৬. ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ
২৭. মুসলিম মা বোনদের ভাবনার বিষয়
২৮. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ
২৯. A guide to Islamic Movement